Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.08-14
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নিঃসঙ্গতার মুখর সময়: নারী পরিসরের কথকতা

ড. প্রশান্ত বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিপুরদুয়ার কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Selina Hossain is one of the most influential novelists in Bengali literature. Her famous writings include novels, short stories and many articles covering various subjects. In this paper we will focus on female space in the society in which actually the female have a marginalised position. In her novels, particularly in 'Nisshongotar Mukhor Shomoy' we have seen the main characters Jaynul and his wife Rashidun who while leading asocial life have confronted so many critical existential questions. But the female cannot enjoy the equality of position in the male dominated society. Every society dominates the female regardless of race, caste, sex and religious matter. The writer has shown in discourse that women should realise their own existence and highlighted the condition of Muslim society and culture relating to women issues and problems. Feminist point of view addresses the issues like self development, self-identity and rights of women. The writer here wants to raise female voice and establish women empowerment. Feminist theory analyses different motifs for the space of women. In this study, feminism has its focus on various aspects of the culture of divorce in female life. Selina Hossain has focused on Muslim divorce culture and struggle of the female to gain a social value in future life.

Key words: Female Space, Male Dominance, Mental Agony, Identity Crisis, Women empowerment.

বিশ্বায়ন যুগে নারীর ক্ষমতায়ণ অলীক কল্পনা নয়। তবুও নারীচেতনাবাদ তত্ত্বে এই প্রশ্ন উঠে আসে সহজেই যে, একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে নারী কী তার প্রকৃত অধিকার অর্জন করতে পেরেছে? ১৮৭০ সালে শিশু-কন্যা হত্যা নিবারণ বিল পাস হলেও আজও ভ্রূণহত্যা বা কন্যাসন্তান হত্যালীলা অব্যাহত। রাষ্ট্রীয় সচেতনতা মূলক নীতি প্রচারিত হলেও ধর্ষণ, অ্যাসিড আক্রমণ, বধূনির্যাতনের মতো বিভিন্ন অভিশাপ থেকে মুক্ত নয় সমাজ। তবে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরও মানসিকতার বদল ঘটে চলেছে। নারী পরিসর বহুমাত্রিকতার অবয়বে লক্ষ করলেও এখনও নারী তার নিজস্ব পরিসর খুঁজে পায়নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্যে আজও নারীর প্রতি পিতৃতন্ত্রের রক্তচক্ষু সদা জাগ্রত। আইনকানুন তৈরি হলেও নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নারীচেতনাবাদের আলোচনায় নারী পরিসরের বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচিত হলেও নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার কে দেবে? একথা আরও বেশি করে ভাবা উচিত সকলের। পিতৃতন্ত্রের চাপিয়ে

দেওয়া আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ গুলি হয়ে উঠেছে নারীদের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার অন্যতম কারণ। নারীচেতনাবাদ তত্ত্বে নারীর নিজস্ব পরিসর ও তার ক্ষেত্র-সমীক্ষা এবং নারীর বিভিন্ন ইস্যু গুলিকে বহুস্তরীয় ভাবনায় পর্যালোচনা করে। প্রকৃত নারী সত্তার উন্মোচন ও তার বিচার-বিশ্লেষণই নারীচেতনাবাদের প্রধান বিষয়। ফলে নারী তার আত্মমর্যাদায়, আত্মবিশ্বাসে, স্বাধীনচিন্তায়, সমঅধিকারে ও আর্থিক স্বনির্ভরতায় নিজস্ব পরিসরের খোঁজ করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

বাংলা সাহিত্যে সেলিনা হোসেন(১৪-০৬-১৯৪৭) এই সময়ের অন্যতম শক্তিশালী এক কথাসাহিত্যিক। গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি এক বিরল প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তিনি বাংলা একাদেমি পুরস্কারসহ অন্যান্য পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য উপন্যাস গুলি হল- 'উত্তরসারথি'(১৯৭১), 'জলোচ্ছ্বাস'(১৯৭৩), 'হাঙর নদী গ্রেনেড'(১৯৭৬), 'মগ্ন চৈতন্যে শিস'(১৯৭৯), 'যাপিত জীবন'(১৯৮১), 'নীল ময়ূরের যৌবন'(১৯৮৩), 'পদশব্দ'(১৯৮২), 'চাঁদবেনে'(১৯৮৪), 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি'(১৯৮৬), 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি'(১৯৮৭), 'ক্ষরণ'(১৯৮৮), 'কাঁটাতারের প্রজাপতি'(১৯৮৯), 'খুন ও ভালোবাসা'(১৯৯০), 'কালকেতু ও ফুল্লরা'(১৯৯২), 'ভালোবাসা প্রীতিলতা'(১৯৯২), 'টানাপোড়েন'(১৯৯৪), 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'(১ম খণ্ড ১৯৯৪),(২য় খণ্ড ১৯৯৫),(৩য় খণ্ড ১৯৯৬), 'দীপান্বিতা'(১৯৯৭), 'যুদ্ধ'(১৯৯৮), 'লারা'(২০০০), 'মোহিনীর বিয়ে'(২০০১), 'কাঠকয়লার ছবি'(২০০১), 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর'(২০০৪), 'মর্গের নীল পাখি'(২০০৫), 'অপেক্ষা'(২০০৭), 'দিনের রশিতে গিটঠু'(২০০৭), 'মাটি ও শস্যের বুনন'(২০০৭), 'পূর্ণ ছবির মগ্নতা'(২০০৮), 'ভূমি ও কুসুম'(২০১০), 'যমুনা নদীর মুশায়রা'(২০১১), 'গাছটির ছায়া নেই'(২০১২), 'আগস্টের একরাত'(২০১৩), 'গোরিলা ও বীরাঙ্গনা'(২০১৪), 'দিন কালের কাঠখড়'(২০১৫), 'নিঃসঙ্গতার মুখর সময়'(২০১৬), 'বিষণ্ণ শহরের দহন'(২০১৯), ও 'সময়ের ফুলে বিষপিঁপড়া'(২০১৯) প্রভৃতি। তাঁর উপন্যাস যাপিত জীবনের বহুবিধ বিষয় ও বিষয়ীর সমাবেশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের মূল্যবোধকে তিনি তুলে ধরেছেন সময়ের দাবি মেনেই। দেশভাগ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের সত্য ও তথ্যের স্তরগুলিকে উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন লেখিকা। ফলে তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মিথ, ভাষা প্রভৃতি স্থান করে নেয় বিনির্মাণের আকল্প হিসেবে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুবিধ বিষয়কে আলোকিত করার এক প্রয়াস লক্ষ করা যায় লেখিকার কলমে। তিনি নিজেই আমাদের জানিয়েছেন - "আমি বলতে চাই, যাদের কথা বলতে চাই, যেভাবে বলতে চাই তার জন্য বড়ো ক্যানভাস দরকার – যেখানে জীবন একটি পরিপূর্ণ শিল্প হয়ে ফুটে উঠবে, থাকবে রক্ত এবং কাঁটার মাখামাখি, থাকবে বাস্তব এবং স্বপ্নের আশাবাদ, যা মানুষের জন্য মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলা মানবিক সভ্যতা।"[১]

সেলিনা হোসেনের 'নিঃসঙ্গতার মুখর সময়'(২০১৬) উপন্যাসটি 'ভারত বিচিত্রা' পত্রিকায় 'নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়' নামে অক্টোবর ২০১৩ থেকে এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশের সময় উপন্যাসের শেষ অধ্যায়টি সংযুক্ত হয়েছে। এবং উপন্যাসটির জন্য সেলিনা হোসেন 'সিটি-আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬' পেয়েছেন। উপন্যাসের উপাদান গ্রহণ তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞান লব্ধ বলেই আমাদের মনে হয়। কারণ তিনি নিজেই এক বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানিয়েছেন—"ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহেশপুর গ্রামের সুরাইয়া বেগম চার কন্যাসহ ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা

করেছেন। একটি পুত্রসন্তানের জন্য তাঁর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার উদ্যোগ নিলে সুরাইয়া বেগম আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন।"[২] আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটিও বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ-সম্পৃক্ত পটভূমিতে জয়নুল ও রাশিদুনের দাম্পত্য জীবন-যাপনের বিচ্ছেদ-বেদনার সঙ্গে তাদের পাঁচ কন্যার সংকটময়তাকে তুলে ধরেছেন। এই যুগে নারীর প্রকৃত অবস্থান ঠিক কোথায় সেই প্রশ্নটি উপন্যাসে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। যদিও সেলিনা হোসেন সুস্থ-সজীব-বৈষম্যহীন এক সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। তবুও সমাজের নানা অন্ধকার দিক গুলিকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে তুলে এনে দেখাতে চেয়েছেন সমাজ-সম্পৃক্ত কাঠামো ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর কোনো পরিসর নেই, নারীকে শুধুমাত্র যৌন পুত্তলিকা ও সন্তান উৎপাদনের গর্ভাশয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হত না। আবার এই সমাজে কন্যাসন্তানের কোনো স্বীকৃতি নেই, পুত্রসন্তান হলে তো 'পোয়া বার', যেন ক্ষমতার বারান্দায়- পুরুষের প্রকৃত পুরুষত্ব জেগে ওঠে। পুত্র সন্তানই একমাত্র বংশ পরম্পরায় বংশরক্ষা ও সম্পদের অধিকার লাভ করে থাকে। জয়নুলের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রত্যাশা ছিল পুত্রের পিতা হবে। কিন্তু চার কন্যার জন্মের পর, পুনরায় কন্যাসন্তান জন্ম হওয়ায়, তার প্রত্যাশা খর্ব হয়ে যায়। জয়নুল আক্ষেপের সঙ্গে জানায়-- "চার মেয়ের পরে আমি একটি ছেলের জন্মের অপেক্ষায় ছিলাম"[৩] জয়নুল-রাশিদুনের দাম্পত্য জীবন-যাপনের মাঝে প্রথমত, কন্যাসন্তানের জন্ম এবং দ্বিতীয়ত, পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিন তালাক, দুইয়ের সমন্বয়ে হয়ে ওঠে এই সংকটময়তার অন্যতম কারণ। জয়নুল শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, সে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ মানসিকতার মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ। কন্যাসন্তানের জন্মের দায় নিতে পারেনি বলে জয়নুল 'তিন তালাক' উচ্চারণ করে। যেখানে সদ্য জন্মানো কন্যার নাড়ি পর্যন্ত কাটা হয়নি, অথচ সেই আঁতুড় ঘরে বসে রাশিদুনকে শুনতে হয় এই 'তালাক' শব্দ। এই শব্দ ধর্মীয় মোড়কে আবদ্ধ, তবে রাশিদুনের কাছে এই 'প্রসববেদনা' থেকেও অনেক বেশি বেদনাদায়ক 'তালাক' শব্দটি। রাশিদুন এই 'তালাক' নামক বিধানকে নীরবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এখানে নারীর প্রতি সামাজিক নিষ্ঠুরতা বড় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, বেগম রোকেয়া বহুকাল আগেই প্রশ্ন করেছিলেন- "আমাদের ধর্মমতে বিবাহ হয় পাত্রপাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুক, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় একতরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা?"[৪] উপন্যাসে আমরা দেখি বিচ্ছেদ নেমে এসেছে একতরফা ভাবেই। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোগত ধারণাই বয়ে চলেছে অনন্তকালের পথ ধরে। সামাজিক কুসংস্কার অব্যাহত থাকে শুধুমাত্র পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই। সমাজে জয়নুলের মতো মানসিকতার পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ ও তার উদ্দেশ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে খুব সহজে। মল্লিকা সেনগুপ্তের 'পাণ্ডুর পুত্রাকাঙ্ক্ষা' কবিতায় আমরা লক্ষ করি-- "রাজ্যসুখ ধনমান কিছুই চাই না/ চাই না কন্যার জন্ম, আমাদের পুত্র চাই শুধু।"[৫] কন্যাসন্তান জন্মের পর, নারীর প্রতি জয়নুলের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। কন্যার নাম রাখা নিয়ে তার মধ্যে লক্ষ করা যায় ঔদাসীন্য। কারণ পুত্রসন্তানের পিতা হবে ভেবে একটি নাম পূর্বেই সে ঠিক করে রেখেছিল। শিউলি ও বকুলের জন্ম পর্যন্ত জয়নুল হাসি-খুশি থাকলেও জয়নুলের প্রত্যাশা ছিল রাশিদুন একটি ছেলের জন্ম দেবে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়াও হয়েছিল। দাম্পত্য জীবনের চাওয়া-পাওয়ার মাঝে রাশিদুন জয়নুলকে বলতে বাধ্য হয়েছে, যে-- "ছেলের জন্ম কি আমার হাতে? তোমার কপালে না থাকলে আমি কী করব। আল্লার কাছে চাও। কান্দ।"[৬] এই দাম্পত্য জীবনের কেন্দ্রে পিতৃতান্ত্রিক পরিভাষায়- 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই অনুশাসনই অব্যাহত থাকে। রাশিদুনকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল থেকে শুরু করে জোরপূর্বক যৌন

হেনস্থাও সহ্য করতে হয়। রাশিদুনের কথায় --- "আমাকে জোর করে গর্ভ বানালে আমার মেয়ে হবে। বলে দিলাম মেয়েই হবে। মেয়ে হলে আমার দুঃখ নাই। তোমার আছে। তুমি একটা খচ্চর।"[৭] পিতৃতন্ত্রের এই শিকার ও শিকারির খেলায় লৈঙ্গিক রাজনীতির আসল চেহারা যেন সহজেই উন্মোচিত হয়ে ওঠে।

নারী যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে চলছে। রাশিদুন অসহায় নারীর প্রতিনিধি স্বরূপ। শুধু মুসলিম সমাজ নয়, গোটা নারীজাতি সর্বত্রই কোণঠাসা। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক বড়, সেখানে জীবন-যাপনে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, স্নেহ-ভালবাসার স্থান অত্যন্ত নিচু দরের হয়ে যায়। আর দাম্পত্য সম্পর্ক জটিলতার স্রোতে ক্রমশ ভেসে যায়। তাই রাশিদুন তার বিচ্ছেদ-বেদনাকে আপসহীন ভাবেই মেনে নিয়েছে। তার কোনো প্রতিবাদের ভাষা নেই। এই বিচ্ছেদ-বেদনাকে আপন করে নেওয়া ছাড়া তালাক প্রাপ্ত নারীর কাছে অন্য কোনো উপায় থাকে না। নারীকে তো কারও অধীনে থাকতে হয়, তাই রাশিদুন স্বামীর ঘর ছেড়ে ভাই-এর অধীনে থাকতে বাধ্য হয়েছে, নিজেকে ধাইমা কাজে নিযুক্ত করেছে। এই পারিবারিক বিপর্যয়ে প্রত্যেকেই নিজের ভেতরে নিঃসঙ্গতার বোধ অনুভব করেছে। ক্রমশ মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এই পরিবারের সকলে। কেউ স্বামী হারা, কেউ মাতৃ হারা, আবার কারও স্ত্রী থেকেও নেই। একমাত্র পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারার অপরাধে রাশিদুনের অস্তিত্ব হয়ে পরে বড় দুর্বিষহ। স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙেছে পাঁচ মেয়ের শৈশব। শৈশবই মানুষের সুন্দর জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু এই পাঁচ কন্যা তাদের মাকে হারিয়ে স্নেহ-ভালোবাসা, সখ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের মা বেঁচে থেকেও তাদের কাছে নেই। তাদের এই অভাববোধই নিঃসঙ্গতার গভীরে প্রবেশ করিয়েছে এবং নারী হয়ে তাদের জন্মানোতে অস্তিত্বের সংকট অনুভব করতে থাকে এই বলে--- "আমাদের জন্ম না হলেও মাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হতো না।"[৮] মা-বাবার মানসিক যন্ত্রণার আঁচ এসে লেগেছে পাঁচ কন্যার মনোজগতে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্নেহ, মায়া-মমতার আবেগে নানা অভাব-অভিযোগ গুলি তাদের কথোপকথনে বার বার উঠে এসেছে।

পাঁচ কন্যার সঙ্গে জীবন-যাপনে জয়নুলের মানসিকতার বদল বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। জয়নুল নিজের ভুলের অনুশোচনায় জর্জরিত। তবু কন্যারাই তার জীবনকে আড়াল করে রাখে। জয়নুল তার ভুল বুঝতে পারলেও তালাক প্রথার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার থাকে না। ফলে নিঃসঙ্গতা ঘনীভূত হয়ে ওঠে জয়নুলের মানসিক ও শারীরিক দুদিক থেকেই। মেয়েদের সামনে যেন ছোটো হয়ে যায় জয়নুল। ব্যক্তি সত্তার টানাপোড়েনে মেয়েরাই যেন হয়ে ওঠে পিতার আসল বিচারক। সে জানে কোনো দিন রাশিদুনের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। বিষাদগ্রস্থ জয়নুলকে সারাজীবন ভুলের মাসুল গুনে চলতে হবে। এই নিঃসঙ্গ জীবন খুঁজে বেড়ায় রাশিদুনকে এবং অতীতের স্মৃতি গুলি যেন তাকে আরও বেশি বিষণ্ণতার গভীরে নিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে রাশিদুন তাকে ক্ষমা না করলে তার দোজখেও স্থান হবে না। জয়নুল ব্যক্তি সংকটের টানাপোড়েনে পরাজিত এক মানুষ এবং সামাজিক পরিসরে তার গ্লানি বোধ আরও বেশি তাকে সংকুচিত করে তোলে। যেন জয়নুল শুনতে পায় রাশিদুনের রাগি কণ্ঠস্বর – "ছেলে ছেলে কর, গরিব মানুষের আবার বংশ কি! রাত পোহালে দিন শেষ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যার তার আবার বংশ রক্ষা। ফুঃ। থাকে শুধু মরে গেলে তিন হাত মাটি।"[৯] রাশিদুনের এই নিরুচ্চার উচ্চারণ যেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে আঘাত করেতে চায়।

সেলিনা হোসেন জয়নুলের পাঁচ কন্যাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিপ্রতীপ কোণে অবস্থান করেছেন। শিউলি, বকুল, হাস্নাহেনা, চম্পা ও পদ্ম নামে পাঁচটি ফুলের নামকরণের সঙ্গে এক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন লেখিকা। ফুলের শোভায় পাঁচ কন্যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে নারীর বিশেষ পাঁচটি দিককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আলোকপাত করেছেন। শিউলি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, বকুল সৌদি-আরবে গিয়ে টাকা উপার্জন করে, চম্পার স্বপ্ন ঢাকায় গার্মেন্টসে কাজ করবে, হাস্নাহেনা এতিম ছেলে বাউলার সঙ্গে গানের রানি হবে, আর পদ্ম খেলোয়ার – যেখানে যায় সেখানে দৌড়ে ফার্স্ট হয়। সময় ও সমাজ পরিসরে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, স্মৃতি, কল্পনা ও বাস্তবের গাঁথামালায় আখ্যান হয়ে ওঠে পিতৃতান্ত্রিক ধারণার প্রতিস্পর্ধী স্বরূপ। তারা প্রত্যেকেই স্বপ্ন দেখেছে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের এবং নিজেদের সিদ্ধান্তে অটুট থেকে বাস্তবায়নের পথ থেকে পিছপা হয়নি কখনও। তারা সমাজকে দেখতে চায় আধুনিক সময়ের মানদণ্ডে। যেখানে নারী চিরকাল পরনির্ভরশীল, তাদের কোনো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই। এই পরাধীনতার কারণ শুধু কী লিঙ্গগত? আমরা লক্ষ করি, পাঁচ বোন নিজেরা কন্যা হয়ে জন্মানোর ক্ষেদ বার বার প্রকাশ করেছে। ছোটো বোন পদ্ম বলেছে- "তোমরা চার বোন না হয়ে চার ভাই হলে আমার জন্য এমন স্মৃতির ভার হতো না। তোমরা কেন ছেলে হলে না? তা হলে তো সব দোষ আমাকে দিতে পারতে না।"[১০] কিন্তু সমাজে লৈঙ্গিক রাজনীতি যে ভয়ংকর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তবুও নারী সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলছে নিজস্ব পরিসর খুঁজে নেওয়ার জন্য। আখ্যানে লক্ষ করা যায় যে, জয়নুলের পাঁচ কন্যা ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেও পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, স্বপ্ন, স্নেহ, প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতিতে নারীর ক্ষমতায়ণের বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাদের কাছে পরাজিত। রাশিদুন ও খলিলুরের বউ-এর কথোপকথনে উঠে আসে- যদি হাস্নাহেনার গর্ভে যদি কন্যা সন্তান আসে তাহলে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। আমরা লক্ষ করি সেই প্রতিবাদী স্বরটিকে-- "মাইয়ার গর্ভে যদি একটা মাইয়া আসে তার কী হবে? আমরা দা-বঁটি নিয়ে খাড়ায়ে থাকব। জামাই যেন একটা কথা বলতে না পারে।"[১১] লেখিকার এই সমবেত স্বরবিন্যাস নারীর প্রতিবাদের ভাষা বটে, যা বৃহত্তর নারী সমাজে খুবই প্রয়োজন। রাশিদুন নিজে যখন কন্যার জন্ম দিয়েছিল তখনও তার অবচেতন মনেও প্রতিবাদী সত্তার ভাষ্য জেগে উঠে ছিল। আবার হাস্নাহেনা বিবাহের পর ঢাকায় গিয়ে চাকরি করবে সে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। রাশিদুনকে সে বলেছে – "আমিও চাকরি করব মা। শুধু রান্না করার জন্য ঘরে বসে থাকব না।"[১২] এখানে বোঝা যায় নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অচলায়তন থেকে বেড়িয়ে এসে তাদের নিজস্ব পরিসরকে খুঁজে নিতে চাইছে। পুরুষের ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তারের ফলে নারী সামাজিক ভাবেই নিম্নবর্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অন্তেবাসী নারীর কোনো পরিসর থাকতে পারে না এবং থাকে না কোনো সোচ্চার উচ্চারণ। তাই গায়ত্রী স্পিভাক চক্রবর্তী মনে করেছেন- "There is no space from which the sexed subaltern subject can speak."[১৩] তবুও সেলিনা হোসেনের সৃষ্ট চরিত্ররা যেন নিরুচ্চার হয়েই তাদের নিজস্ব পরিসরে এক ভাষা খুঁজে চলেছে।

সেলিনা হোসেনের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে নারী পরিসর গুলি বহুমাত্রিকতায় উঠে এসেছে। শাশুড়ি ও পুত্রবধূ, মা ও মেয়ে, এবং স্বামী ও স্ত্রীর বহুমুখী সম্পর্কের নারী কেন্দ্রিক পরিসর গুলিকে উন্মোচন করে তার পর্যালোচনা করেছেন। আমরা তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে সংগ্রামী ও সংবেদনশীল নারী চরিত্রের ক্ষোভ-যন্ত্রণা থেকে প্রতিবাদের ভাষাকে সোচ্চার ও নিরুচ্চার দুই ভাবেই লক্ষ করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্ট

নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও বৃহৎ সামাজিক সমস্যা নারী হয়ে জন্মানো এবং তালাক প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথে জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন লেখিকা। আমরা লক্ষ করি, জয়নুলের মায়ের সঙ্গে রাশিদুনের কোনো দ্বন্দ্ব না থাকলেও জয়নুলের মায়ের মধ্যে কোনো প্রতিবাদীস্বর খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার রাশিদুনের অন্তর্জগতে যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বেদনা ও ক্ষোভের জন্ম হয়েছে তা কোনো সোচ্চার ভাবে প্রকাশ পায়নি। তাই উপন্যাসে নারীর প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ পরিস্ফুট ভাবে না ঘটলেও যেন প্রকৃত অর্থে স্বরগুলি সমাজে টিকে থাকার লড়াই-এর জন্যই আলাদা তাৎপর্য নিয়ে এসেছে।

আখ্যানের পরিমণ্ডলে ধরা হয়েছে নারীর বহুমাত্রিক পরিসর। পরিবার বা সমাজে নারীরা যেন তাদের ব্যক্তিগত অধিকার অর্জনের পথে হেঁটে দাবী জানাতে চায়। লেখিকা উপন্যাসের সমাপ্তিতে পিতৃতন্ত্র ও ধর্মের বেড়াজালকে উপেক্ষা করে মানবিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নবনির্মিত করেছেন। তাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে যেন বিশেষ এক বার্তা বহন করে। তাই সমাজ, ধর্ম, কুসংস্কার থেকেও বড় হয়ে উঠেছে মানবিক সম্পর্ক। সন্তানদের মায়ের প্রতি ভালোবাসার জয় মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং রাশিদুনেরও মাতৃত্ব বোধ থেকেই সন্তানদের কল্যাণে নিজের অবস্থান থেকে সরে এসেছে। এভাবেই সেলিনা হোসেন নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পরিসরগুলিকে বহুস্বরিক দ্যোতনায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি গ্রামীণ সমাজ পরিসর থেকে শুরু করে আবহমানকালের বিভিন্ন পরিসরে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরতে ছেয়েছেন। এবং নারীর ক্ষমতায়ণে তাদের চিন্তা-চেতনার বিভিন্ন দিক গুলিকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজস্ব পরিসরে আড়ালহীন করতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১। সেলিনা হোসেন; 'সৃষ্টির নেপথ্যে স্রষ্টার ভাষ্য', বাংলাদেশের কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, তবুএকলব্য -৩৮, সম্পাদক- দীপঙ্কর মল্লিক, দি গৌরি কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা -৯, জানুয়ারি- মার্চ, ২০২০, পৃষ্ঠা- ৭

২। সেলিনা হোসেন; 'সংস্কৃতি ও নারী', প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনা- সুশীল সাহা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৯, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১৯, পৃষ্ঠা- ২৩৭

৩। সেলিনা হোসেন; 'নিঃসঙ্গতার মুখর সময়', কথাপ্রকাশ, ঢাকা- ১১০০, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারি-২০১৬, পৃষ্ঠা- ১০

৪। বেগম রোকেয়া; 'নারীর অধিকার', শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া, সংকলন ও সম্পাদনা ড০ মিজান রহমান, কথাপ্রকাশ, ঢাকা- ১১০০, একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি-২০১২, পৃষ্ঠা- ২৭৫

৫। মল্লিকা সেনগুপ্ত; 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ এপ্রিল-১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৮৯

৬। সেলিনা হোসেন; 'নিঃসঙ্গতার মুখর সময়', কথাপ্রকাশ, ঢাকা- ১১০০, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারি-২০১৬, পৃষ্ঠা- ৯৩

৭। তদেব; পৃষ্ঠা- ৯৩

৮। তদেব; পৃষ্ঠা- ৪৪

৯। তদেব; পৃষ্ঠা- ৮৯

১০। তদেব; পৃষ্ঠা- ৩২

১১। তদেব; পৃষ্ঠা- ১৫৬

১২। তদেব; পৃষ্ঠা- ১৫৮

১৩। Gayatri Chakravorty Spivak, 'Can the Subaltern Speak?', Colonial Discourse and Post-colonial Theory A Reader; Edited by- Patrick Williams and Laura Crisman, Routledge, New York-10017,USA, Published- 2013, page- 103.